

নাটিকা
জাগো সুন্দর
কাজী নজরুল ইসলাম



প্রথম অঙ্ক

- কঙ্কণ : ওংকার! ওংকার! খেলতে খেলতে আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে?
- কল্পনা : আমি— তোমাদের দিদি কল্পনা। কঙ্কণ, ভালো করে চেয়ে দেখো দেখি, আমাকে চিনতে পারো কি না।
- কঙ্কণ : না— হ্যাঁ, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে করতে পারছি নে।
- কল্পনা : আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কী ভাবছিলে, মনে পড়ে?
- কঙ্কণ : হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম, আমি যদি ওই চাঁদের দেশে এক নিমেষে উড়ে যেতে পারতুম, তাহলে কী মজাই না হতো। তারপর মনে হলো আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানাওয়ালা সুন্দরী পরি আছে, সে যেন জাদু জানে, সে যেন এক নিমেষে আমায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারে।
- কল্পনা : ঠিক ধরেছ! এখন চেয়ে দেখো দেখি, আমি সেই পরির মতো কিনা!
- কঙ্কণ : আরে, ঠিক সেই তো! একেবারে হুবহু মিল! আমার মনের সেই পরি তুমি। তোমার নাম কী বললে?
- কল্পনা : আমার নাম কল্পনা। আমায় কল্পনা দি বলে ডেকে!

- কঙ্কণ : ধ্যাৎ, তুমি যে আমারই মতো বড়ো। তোমাকে— আচ্ছা দিদি বললে যদি সুখী হও, তাই বলব। কিন্তু—
- কল্পনা : বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি সেইখানেই নিয়ে যাব। এখন চলো সাগর জলের তলে। (সাগরের শব্দ ভেসে এল)
- কামাল : এই কঙ্কণ! পালিয়ে আয়! ও জাদু জানে, পরির বাচ্চা, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই যাহ! তোর মাদুলিটা ফেলে এসেছিস বুঝি? দেখি আমার তাবিজটা আছে কি না! অ্যা, আমার তাবিজটা— কে নিলে?
- কল্পনা : এখন আর কোনো বীজেই কিছু ফল হবে না কামাল! আমি তোমাদের ফুলের রথে করে সমুদ্র-জলে নামতে শুরু করেছি! ও কী, ওংকার অমন চোখ বুজে আছ কেন?
- ওংকার : ভয় পেলে আমি চোখ বুজে বসে থাকি। কিংবা প্রাণপণে চোঁচিয়ে গান করি।
- কল্পনা : এই চোখ বোজা কার কাছে শিখলে?
- ওংকার : ভেড়ার কাছে।
- কল্পনা : ভেড়ার কাছে?
- ওংকার : হ্যাঁ, আমাদের গায়ে দেখেছিলুম, একপাল ভেড়ার মাঝে একটা নেকড়ে বাঘ এসে পড়ল। যেই নেকড়ে বাঘ দেখা আর অমনি পালের সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।
- কল্পনা : আর তাই দেখে বুঝি নেকড়ে বাঘ পালিয়ে গেল!
- ওংকার : দূর! তা হবে কেন? নেকড়ে বাঘ ভেড়াদের এক-একটার কান ধরে ঘাড় মটকে রেখে আসে, এসে আবার একটার কান ধরে নিয়ে যায়!
- চাকাম ফুসফুস : ওরে বাবারে! গেছি রে গেছি রে, একেবারে মরে গেছি রে মা! (সমস্ত 'স'-এর উচ্চারণ দস্ত্য 'স' দিয়ে) আজ সকালে সাগরের শ্মশান ঘাটে সিনান করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হলো। শ্মশানের শ্যাওড়া গাছের শাকচুম্বিতে ধরেছে রে বাবা!
- কল্পনা : ও কে চিৎকার করে অমন করে? কে ওই ভীলু?
- কঙ্কণ : ওর নাম ন্যাড়া, আমরা ওর নাম রেখেছি চাকাম-ফুসফুস! ও বড়ো ভীলু কিনা! একটু ভয়ের কথা শুনলেই ওর ফুসফুস চুপসে গিয়ে বুকে গর্ত হয়ে যায়।
- কামাল : আর মুখ শুকিয়ে গিয়ে চাকাম চুকুম শব্দ করতে থাকে— তাই ওংকার ওর নাম রেখেছে চাকাম ফুসফুস। [সমুদ্রের শব্দ]
- ওংকার : উহ্ কী ভীষণ গর্জন!
- কামাল : কী ঠান্ডা হিমেল বাতাস! আমার গা শিরশির করছে!
- চাকাম ফুসফুস : আমার দাঁতে দাঁত লাগছে। শ্মশান দেখে কী সর্বনাশটাই হলো! হি হি হি হি! [দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ]
- কঙ্কণ : আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে কল্পনাদি, কিন্তু অত অন্ধকার কেন? সমুদ্রে কি আলো নেই?
- কল্পনা : সাগর-জলের নিচে মণিমুক্তার আলো। আর দেরি নেই, ওই আমরা এসে পড়েছি— সাগরজলের পাতালতলে! খোলো দুয়ার।
- [হঠাৎ যন্ত্রসংগীত ও সাগর-গর্জন বন্ধ হয়ে গেল]

কঙ্কণ : [হাততালি দিয়ে] কল্পনা! দেখো দেখো কী সুন্দর আলো! কত হীরা মানিক মুক্তো! কামাল!
ওংকার!

কামাল : এই কঙ্কণ, খবরদার, ওসব হীরা মানিক ছুঁসনে! আমাদের গাঁয়ে একজন পুথি পড়ছিল, তাতে লেখা আছে— ওসব পরিদের হিকমত। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি!

ওংকার : হাফপ্যান্টের পকেট তো ভরতি হয়ে গেল হীরা মানিকে। আর নিই কোথায়? বাবাকে কতবার বললাম যে, হাফপ্যান্টের দুটো বুক পকেট করে দাও, তা বাবা শুনলেন না। গায়ের জামাটাও ভুলে রেখে এলুম।

চাকাম ফুসফুস : ওরে বাপ রে! কী সর্বনাশটাই হলো। এ যে খই-মুড়ির মতো হীরা ছড়ানো রয়েছে। নিলে শ্যাওড়া গাছের ওই শাকচুমিটা ধরবে না তো?

কল্পনা : শোনো কঙ্কণ, ওংকার, কামাল! তোমরা বড়ো হয়ে আসবে এই সাগর-জলে। এই সাগরকে যে বীর জয় করবে— সে-ই পাবে এই সাগরের হীরা মানিক মুক্তো। এই পাঞ্চজন্য শব্দে বেজে উঠবে তারই শুভ আগমনী বার্তা! কামাল তুমি কী হবে?

কামাল :

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর!
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সপ্তদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার শাল রঙা পাল তুলে
চেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলে দুলে।

কল্পনা : আর কঙ্কণ?

কঙ্কণ : সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, হব সিদ্ধপতি;
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিদ্ধ ভাগীরথী ॥
[সাগর-জলের শব্দ! পুষ্পরথ যেন সাগর হতে উঠে অন্যত্র চলে গেল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ভোর হয়ে এল। পাখির কলরব ভেসে আসছে।]

বেণু : কঙ্কণদা, ওংকারদা! চোখ খোলো, আমরা সমুদ্রের থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ওই দেখো, সুখি উঠছে।

ওংকার : বায়কোপের সুখি নয় তো! কল্পনাদির মায়ায় সব ভুল দেখছি মনে হচ্ছে।

কল্পনা : খুকি, তুমি কোথেকে এলে? তোমার নাম কী?

বেণু : আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইখানেই লেগ মুড়ি দিয়ে গুয়েছিলুম। সব শুনেছি সব দেখেছি। ভয়ে কথাটি কইনি!

কল্পনা : তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গলগ্রহে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু : [ভয় পেয়ে] না! আমাকে পুকুরের কাছে নামিয়ে দাও, আমি এক ছুটে বাড়ি পালাব।

ওংকার : তোর আঁচলে কী রে বেণু? অ! আমার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো মানিক চুরি করেছিস বুঝি? দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেণু : বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপনা থেকে আমার কাছে এসেছে। আমি চুরি করব কেন? আচ্ছা, ওংকারদা, তোমরা ছেলে, তোমরা ও নিয়ে কী করবে? এখন ওগুলো আমার কাছে থাক, তোমার বউ এলে মালা গেঁথে উপহার দেব।

চাকাম-ফুসফুস : [কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে] কাল-ফণী দিদি! ওই শ্যামবাজারের দোতলা বাস যাচ্ছে— ওর ছাদে আমায় টুপ করে ফেলে দাও না। আমি সী করে সোজা সরে পড়ি! কী সর্বনাশটাই হলো আমার।

কল্পনা : তোমার ভয় দূর না-হওয়া পর্যন্ত এমনি ভয় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব তোমায়। ভয়ের মাঝে রেখেই তোমার ভয় দূর করব। আচ্ছা বেণু, তোমার কী ভালো লাগে? চাঁদের দেশ, না মাটির পৃথিবী?

বেণু : মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। ও যেন আমার মা।

কল্পনা : আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছা করে?

বেণু : আমার ইচ্ছা করে—

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে উঠব আমি ডাকি।
সুঘুমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, 'আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!'

ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়
বলব আমি, 'ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়।'
ঝরনা-মাসি বলবে হাসি, 'খুকি এলি নাকি?'
বলব আমি, 'নইকো খুকি, ঘুম-জাগানো পাখি।'

ওংকার : কল্পনাদি, মঙ্গল গ্রহ না চাঁদের দেশে যাবে বলছিলে না? সমুদ্রের জলে ভিজে আমার ভীষণ সর্দি ধরেছে— তাই বলছিলুম যা যুদ্ধ লেগেছে কল্পনাদি, তাতে বুঝে দেখলুম, আমার রাজা টাজা হওয়া পোষাবে না। ও ব্যক্তির চেয়ে অনেক ভালো—

আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে।

বলব, 'দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে।'
 আঁচল ভরে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
 নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
 বাছুরটিরে কোলে করে পার হব বিল-খাল,
 বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।

- কল্পনা : কল্পনাদি, তোমার রথ ধামিয়ে না। চলো হিমালয়ের গৌরীশংকরের চূড়ায়, উত্তর মেরুর বরফ পেরিয়ে
 নাম না-জানা দেশে। চলো চাঁদের বুকে, মঙ্গলগ্রহে।
 কল্পনা : তোমায় নিয়ে যাব কল্পণ, অসীমের সীমা খুঁজতে— অকূলের কূল দেখাতে। তার আগে তোমার পৃথিবীর
 কাজ সেয়ে নিতে হবে। ধরো, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয়, তুমি কী করবে?
 কল্পণ : আমি গাইব গান— আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধূয়া।

(গান)

চল চল চল

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

- কল্পনা : শুধু গান গাইবে? কর্ম করবে না?
 কল্পণ : কর্মই তো আমার প্রাণ। কাজ করি বলেই তো রাত পোহায়।

আমি হব দিনের সহচর—

বলব, 'ওরে রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর!

তোদের ছেলে উঠল জেগে, ওই বাজে তার বাঁশি,
 জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষি।'
 'শ্যাওলা' 'হাঁসা' দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
 লাঙলের ওই কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
 লিখব সবুজ-কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি—
 ওপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাজ্য রবি।
 খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
 ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ।
 এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চিরতাজা,
 আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা ॥

[হঠাৎ সকলে 'ধর ধর গেল' বলে চিৎকার করে উঠল। ঢাকাম-ফুসফুসের, 'কী সর্বনাশটাই হলো রে বাবা' বলে
 চিৎকার শোনা গেল।]

ওংকার : কল্পনাদি, কল্পনাদি, ধরো ধরো, ঢাকাম-ফুসফুস পুকুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কল্পনা : [হেসে] ভয় নেই, ও জল থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে বাড়ির দিকে দৌড় দেবে! তবে দৌড়ে পালাবে কোথায়? আবার আমার কাছে ধরা দিতেই হবে! ও কি বেণু? কাঁদছ? ওগুলো মুক্তো মানিক নয়। তোমরা শুধু ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছ। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আর তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ওই সাগর অভিযানে— সেই দিন সত্যিকারের মুক্তো মানিক পাবে। —তার আগে নয়।

কঙ্কণ : ওদের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চলো না কল্পনাদি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আনব— অমৃত, জরা মৃত্যু থাকবে না— থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

[রথের দূরে যাওয়ার শব্দ]

(গৃহকর্মীর প্রবেশ)

গৃহকর্মী : হেই খোকাবাবু উঠো উঠো। সারা রাত্তির কি ছাদে শুয়ে থাকবে? ঠান্ডা লাগিব যে! উঠো! উঠো!

ওংকার : কঙ্কণদাকে উঠিয়ে না— ও এখন 'রকেট' করে চাঁদের দেশে গিয়ে জ্যোৎস্নার আরক খাচ্ছে। আমি ততক্ষণ ওর পকেটের কমলালেবুটা খেয়ে ফেলি!

[যবনিকা]

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার চুঙ্গলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। এ সময়ই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর রচনায় সামাজিক অবিচার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্য— 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিশ্বের বাঁশি' ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ— 'ব্যথার দান', 'রক্তের বেদন', 'শিউলি-মালা'। উপন্যাস— 'বাঁধন-হার', 'মৃত্যুশ্রুতি', 'কুহেলিকা'। নাটক— 'ঝিলিমিলি', 'আলোয়া', 'শিল্পী', 'মধুমালা' প্রভৃতি। প্রবন্ধ— 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী'। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় শেখনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

কল্পনাশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ নাটকায় কিশোর কঙ্কণের দল স্বপ্ন-কল্পনায় এক পরির সহযোগিতায় চলে যায় সাগরতলের অজানা দেশে। তারা রকেটে চেপে যেতে চায় চাঁদের দেশে ও মঙ্গলগ্রহে। তারা হতে চায় সওদাগর, বিজ্ঞানী কিংবা গ্রামের রাখাল ছেলে। স্বপ্নে পরির রথে চড়ে তারা ঘুরে এসেছে কল্পনার বহু দেশ থেকে। একপর্যায়ে সকালবেলায় তাদের গৃহকর্মী এসে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তারা বাস্তবে ফিরে আসে। তখন বোঝা যায় কিশোরের দলটি ঘরের ছাদে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটিতে কৌতুকপূর্ণ সংলাপ ও দৃশ্যের মাধ্যমে মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। মজার বিষয় হলো— কাজী নজরুল ইসলাম যখন এ— নাটিকা রচনা করেন, তখনও চাঁদের দেশে মানুষের পা পড়েনি।

শব্দার্থ ও টীকা

মাদুলি	— ধাতুর তৈরি ছোটো ঢোলের মতো কবচ।
রথ	— চাকায়ুক্ত অথবা চাকাহীন একধরনের কাল্পনিক বাহন।
শ্মশান	— যে স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হয়।
সিনান	— স্নান।
রঞ্জধীদণ্ড	— কল্পিত পেত্নী।
মণি	— দামি পাথর, যা গহনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মুক্তা	— রত্নপাথর। মুক্তা বিনুকের মধ্যে তৈরি হয়।
পুথি	— হাতে লেখা পুরনো বই বা পাণ্ডুলিপি।
হিকমত	— কৌশল, কায়দা, চাতুর্য।
বুক পকেট	— বুক বরাবর জামার পকেট।
শ্যাওড়া গাছ	
(শেওড়া)	— এক ধরনের জাংলা গাছ।
পাঞ্চজন্য	— শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম।
সওদাগর	— বড়ো ব্যবসায়ী।
মধুকর	— মৌমাছি, ভ্রমর।
বিশ্বজোড়া	— পৃথিবীজুড়ে।
ময়ূরপঙ্খী	— ময়ূর আকৃতির নৌকা।
বজরা	— একপ্রকার বড়ো নৌকা।
সিন্ধুগতি	— সাগরের রাজা।
রেবা	— প্রাচীন ভারতের একটি নদী। বর্তমান নাম নর্মদা।
ইরাবতী	— পান্জাব অঞ্চলের নদী।
সিন্ধু	— বিখ্যাত নদী। এ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা— যা সিন্ধুসভ্যতা নামে পরিচিত।
ভাগীরথী	— ভারতের একটি নদী।
পুষ্পরথ	— ফুল দিয়ে সাজানো রথ।
বায়স্কোপ	— চলচ্চিত্র, সিনেমা।
মঙ্গল গ্রহ	— সৌরজগতের একটি গ্রহ।
দোতলা বাস	— দুই তল বা স্তর বিশিষ্ট বাস।
বেণু	— বাঁশি।
ধেনু	— গাভী

গৌরীশংকর	— হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
উত্তর মরু	— পৃথিবীর সর্ব-উত্তরের বরফ আচ্ছাদিত প্রান্ত।
মাদল	— একধরনের বাদ্যযন্ত্র।
আশিস	— আশীর্বাদ।
দীপ্ত	— উজ্জ্বল।
রবি	— সূর্য। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝানো হয়েছে।
খামার	— মাঠ থেকে শস্য এনে রাখার এবং ঝাড়াই-মোড়াই করার জায়গা।
গোলা	— ধান রাখার জায়গা।
রকেট	— মহাকাশযান। ইংরেজি Rocket.
আরক	— নির্ধাস বা সারবস্তু।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-আনন্দপাঠ

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।